Loka Kalyan Parishad

পরিবেশমূখী প্রাকৃতিক সম্পদ

ব্যবহারের সহজ পাঠ

৮

মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনা

(CRP ও মহিলা কিষাণদের জন্য প্রশিক্ষণ সহায়িকা)

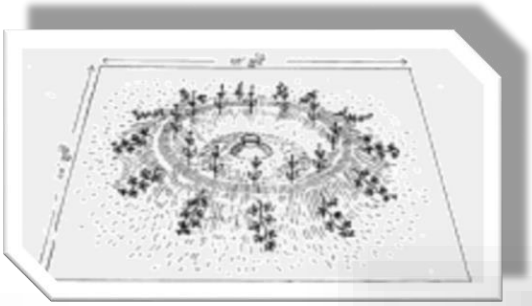

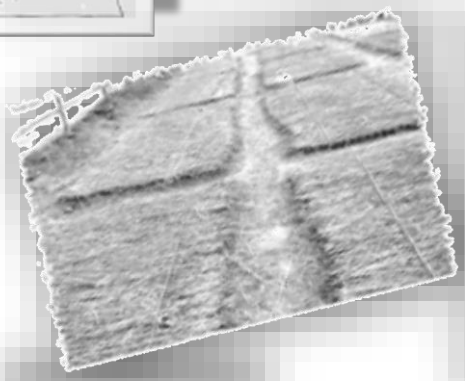

লোক কল্যাণ পরিষদঃ ২৮/৮, লাইব্রেরী রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৬, ফোনঃ ০৩৩ – ২৪৬৫ ৭১০৭ / ৪০৬০৫০৩৬ / ৬৫২৯১৮৭৮

Email: lkpmksp2013@gmail.com, lkp@lkp.org.in, lokakalyanparishad@gmail.com, Website: http://www.lkp.org.in

ভূমিকা

মাটি জীব জগতের ভিত্তি, উদ্ভিদ সরাসরি মাটির উপর নির্ভরশীল- মাটি থেকেই বেশীর ভাগ পুষ্টি সংগ্রহ করে। আর প্রাণীকুল বেঁচে থাকার জন্য, খাবারের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। কাজেই মাটির স্বাস্থ্যের উপর উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে মাটি। বয়ে এসেছে প্রাণী জগতের ধারা মাটির উপর ভিত্তি করে। কিন্তু বর্ত্তমানে মানুষের লোভ ও অজ্ঞানতার ফলে মাটি হয়ে পড়েছে দুর্বল। সৃষ্টিকে সুস্থায়ী, টেকসই করতে হলে মানুষেরই দায়িত্ব নিতে হবে। শিখতে হবে সুষ্ঠ, পরিবেশমূখী মাটির ব্যবহার। বুঝতে হবে মাটির জীবন।

এই পুস্তিকাতে মাটিকে বোঝার ও সুস্থায়ী ব্যবহারের ভাবনা ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভারত সরকার ও পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকারের অন্তর্গত 'আজীবিকা মিশন' ও 'আনন্দধারা'-র যৌথ উদ্যোগে 'মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনা' প্রকল্পটি লোক কল্যাণ পরিষদ সারা রাজ্যের ৫টি জিলা, ১১টি ব্লক ও ৫০টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৬০ হাজার মহিলা কিষানদের সাথে নিয়ে রূপায়িত করছে। এই প্রশিক্ষণ সহায়িকা-টি প্রকল্পভূক্ত মহিলা কিষাণ সম্প্রদায় ও তৃনমূল স্তরের প্রশিক্ষণ কর্মী সি.আর.পি / পি.পি. –দের জন্য ব্যবহৃত হবে।

অমলেন্দু ঘোষ

সম্পাদক

লোক কল্যাণ পরিষদ

মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনা (MKSP)

একটি জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (NRLM) এর উপপরিকল্পনা

গ্রামীণ কৃষক পরিবারের মহিলাদের 'মহিলা কিষাণ' হিসাবে সামাজিক পারিবারিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও জীবিকার উন্নয়ন।

উন্নয়ন উদ্যোগের প্রক্রিয়াঃ

ক) 'মহিলা কিষাণ' সংগঠিত হবেন এবং যৌথ সিদ্ধান্ত নেবেন –স্থানীয় ব্যবহারযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলি কিভাবে ব্যবহার করবেন এবং কি ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন।

খ) খরা প্রবণ অঞ্চলের উপযুক্ত বৃষ্টি নির্ভর ও সুস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থাপনাঃ যেমন – কম জলের ফসল চক্র, অপ্রচলিত উপযুক্ত বহুবর্ষজীবী ফসল, উপযুক্ত ঐতিহ্যপূর্ণ বনেদী ফসলগুলির পুনঃপ্রচলন, ডাল ও তেলবীজ ইত্যাদির উৎপাদন, প্রচার, প্রসার ও প্রচলনের সহায়তা।

গ) চাষকে সুস্থায়ী করার লক্ষ্যে নিবিড়, বহুমূখী ও সুসংহত (Integrated System) প্রযুক্তির ব্যবহারে সহায়তা করা।

ঘ) সরকারি, বেসরকারি জলাভূমি, জমি ইত্যাদিতে অংশীদারির ভিত্তিতে দলগুলিকে যৌথ চাষ ব্যবস্থার প্রচার ও প্রসার ঘটানোয় নিয়োজিত করা।

ঙ) খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণ, মূল্যমান বাড়ানো ও ব্যবসায়ের মাধ্যমে আয় বাড়ানোর উদ্যোগে একটি স্থিতিশীল উপযুক্ত বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

উক্ত প্রক্রিয়াগুলির সঠিকভাবে সম্পাদনার ফলে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্ত্বার সাথে সাথে মহিলা কিষাণের আয় বাড়ানো সম্ভব হবে।

উন্নয়ন উদ্যোগের বিষয় ভিত্তিক কৌশলঃ

ক) মাটি ও জমির স্বাস্থ্য উদ্ধার ও উন্নয়ন

- ✓ জমির আল বাঁধা, পুকুরের পাড় বাঁধা ও ব্যবহার যোগ্য করা, সারা বছর ভূমির উপর জৈব ও ফসলের ঢাকনা, মাল্‌চের ব্যবহার ইত্যাদি
- ✓ জমির নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়ন
- ✓ খামারের বর্জ্য পুনর্নবিকরণ ও ব্যবহার, সবুজ সার, জৈব সার ইত্যাদির ব্যবহার বাড়ানো
- ✓ শস্য পর্যায়ে ডাল জাতীয় ফসলের অন্তর্ভুক্তি

খ) ভূমি ও জল সংরক্ষণ – ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে উন্নয়ন

- ✓ জমির সমোন্নত আলে ফসলের ঢাকনা, উৎপাদন
- ✓ জমির সমোন্নত আল তৈরি, আল শক্তপোক্ত করা
- ✓ মজা জলাশয় উদ্ধার ও নতুন জলাশয় খনন
- ✓ মাঠ কুয়া, শোষক কুয়া, (সোক পিট), জলধারণ ব্যবস্থা তৈরি

গ) ব্যয় সাশ্রয়কারী সুস্থায়ী চাষ প্রযুক্তি

- ✓ ভেষজ কীটনাশক দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
- ✓ রাসায়নিক সার, বীষের ব্যবহার কমিয়ে ক্রমান্বয়ে বন্ধ করা
- ✓ জৈব সার, জীবাণু সার উৎপাদন ও ব্যবহার বাড়ানো – আয় করা

ঘ) ঝুঁকিপূর্ণ, বিপদজনক কাজের বিকল্প

- ✓ বিষমুক্ত চাষ ও খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা
- ✓ রাসায়নিক বিষের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করা, মুখোস, হ্যান্ড গ্লাভ্‌স, যন্ত্র ইত্যাদির ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা

ঙ) জীব বৈচিত্র সুরক্ষা – সচেতনতা বৃদ্ধি ও অনুশীলন

- ✓ পছন্দ সই, উপযুক্ত বনেদী ফসলের প্রচলন, পুনঃপ্রচলন

- ✓ মহিলা কিষাণের দলীয় বীজ ভাণ্ডার তৈরি, প্রসার – কন্দ, মূল, ছোট দানা শস্য ইত্যাদি

চ) পরম্পরাগত জ্ঞান ও কৌশলের প্রসার ও প্রচার

- ✓ মহিলা কিষাণদের জন্য পরম্পরাগত সুস্থায়ী চাষের পরিবেশ সম্পর্কে অনুশীলন
- ✓ বহুতল চাষ ব্যবস্থাপনা, বহুমূখী সুস্থায়ী চাষ ব্যবস্থাপনা – অনুশীলন, প্রচার ও প্রসার

ছ) পরিবেশ পরিবর্তন, উষ্ণায়ণ ইত্যাদি নিরসনে বহুমূখী প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রচার ও প্রসার

- ✓ কৃষি ভিত্তিক বনসৃজন – রাস্তা, খাল, নদী, রেল পাড়, পতিত জমি ইত্যাদিতে কিষাণ বন (ফল, পশুখাদ্য, জ্বালানী, সার উৎপাদনকারী, আসবাবী বৃক্ষাদি) তৈরি

জ) উপরোক্ত বিবিধ কার্যক্রম বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মসূচীর সঙ্গে মহিলা কিষাণদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার মান উন্নত করা

ঝ) সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রসারের জন্য উপযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহ তৃণমূল স্তর থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত নিবিড়ভাবে সক্রিয় করা

সূচীপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	জলের গান – জল সম্পদ কেমন আছে	১
২	চাষের জন্য জল - ধারণা	৩
৩	আচ্ছাদন বা মালচ – মাটির রস ধরে রাখার প্রযুক্তি	৬
৪	কলসী সেচ – কম জলে, কম পরিশ্রমের প্রযুক্তি	৮
৫	পয়রা চাষ বা বিলে ক্রপিং – মাটির সঞ্চিত রসে চাষ	১৩
৬	জল সংরক্ষণ ও সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কি কি কাজ করা যাবে	১৬

লোক কল্যাণ পরিষদঃ ২৮/৮, লাইব্রেরী রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৬, ফোনঃ ০৩৩ – ২৪৬৫ ৭১০৭ / ৪০৬০৫০৩৬ / ৬৫২৯১৮৭৮

Email: lkpmksp2013@gmail.com, lkp@lkp.org.in, lokakalyanparishad@gmail.com, Website: http://www.lkp.org.in

আমাদের জলছবিটা

(কথা : ড : বিবেকান-দ সান্যাল। সুর : কবিগান, ছেলে মেয়ে গাইবে)

গ্রহে, গ্রহান্তরে জল খুঁজে বেড়াই। যদি থাকে ? ভাবি জীবন খুঁজে পাবো। বসুন্ধরা - মা আমার, তোমার, সকলের। অকৃপণ হাতে সাজিয়েছেন সব চাহিদার জল। চিনি নাই তারে। রাখিনি যতনে। এবার দেখি আমাদের জল ছবিটা !

শোনো শোনো ওরে ভাই শোনো দিয়া মন
জলের মাহাত্মের কথা করিব বর্ণন
আহা করিব বর্ণণ ।।
জল কারে কয় আমরা কি ভাই সকলেই জানি ?
জল কারে কয় আমরা কি ভাই সকলেই জানি ?
খালে বিলে নদী নালে আছে যত পানি !
আহা আছে যত পানি ।।
জল যে জীবন মানুষে তো সকলেই কয়
মানুষ গরু গাছ বন্যপশু সবাই বেঁচে রয়।
আহা সবাই বেঁচে রয় ।।
আরও আছে মাটির তলে তাও সকলে জানি
আরও আছে মাটির তলে তাও সকলে জানি
সেচের কাজে ব্যয় করিলে কুয়োয় রয়না পানি।
আহা কুয়োয় রয়না পানি ।।
আমাদের জল ছবিটা জলের মতো নয়
আবার শোনো জলের কথা, জল কভুনা হয়,
আর্সেনিক আর লবন যদি অতিমাত্রায় রয়,
রান্না খাওয়া দূরের কথা সেচের কাজেও নয়
ফসল মাটি দূষবে জেনো, কঠিন নিরাময়
আহা কঠিন নিরাময় ।।
বাঁচতে য দি চাও ভাই সব, নিদান দিয়ে যাই,
জৈবসারে রসাও মাটি পুকুর কাটো ভাই।
আহা পুকুর কাটো ভাই ।।
খাবার জল যে সব্‌সে আচ্ছা জেনে রাখো ভাই
প্রথম বৃষ্টি গেলে পরেই ধরে রাখা চাই
আহা ধরে রাখা চাই ।।
খাবার জলের ভাবনা ভাবো, নয়তো কঠিন কাজ
ওপর থেকে খাবে সে জল, ফিটকারি দাও আজ।

আহা ফিটকারি দাও আজ ।।
ওপরের তিন এর দুই খাবার কথা বলি -
নীচের থেকে তিনের এক গোবরে দাও ফেলি ।
জল বিক্রি, নদী বিক্রি এখন শোনা যায়
ছেলে পুলে কপাল ঠুকবে, বলবে হায় হায়
আহা বলবে হায় হায় ।।
সহজ করে জলের কথা শুনিয়ে গেলাম আজ
জলের কথা মনের কথা মনে রাখাই কাজ
আহা মনে রাখাই কাজ
অল্প বলে জলের কথা সমাপন হল
গানের পরে দল বেধে ভাই মাঠের পানে চলো
আহা মাঠের পানে চলো ।।
কার্য্যকারণ, খুটিনাটি প্রশ- তেমন পেলে ?
গানের পরে বলে য াব রাখছি এখন বলে ।
আহা রাখছি এখন বলে ।।

চাষবাসের জন্য জল

চাষবাসে ভালো বীজ, উর্ব্বর মাটির মতই জলেরও ভূমিকা সমানই। ভালো মাটি, ভালো বীজ, ভালো সার, পুঁজি ইত্যাদি থাকলেও পুরো চাষ ব্যবস্থাটি জলের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল-বেশী জল বা কম জল, যে কোন অবস্থাই, সেটা বৃষ্টির বা সেচের জলেই হোক বা মাটির সঞ্চিত রসই হোক।

উদ্ভিদ জলের মাধ্যমেই মাটি থেকে বেশীর ভাগ খাদ্য সংগ্রহ করে। পরিবেশের তাপমাত্রা, আর্দ্রতার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে জলই বিশেষ ভূমিকা পালন করে। চাষের ক্ষেত্রেও জলের বা মাটিতে রসের অভাব হলে উৎপাদন ব্যাহত হয় এটা আমরা সকলেই জানি। আবার অতিরিক্ত জলেও চাষের ক্ষতি হয়, উৎপাদন ব্যাহত হয়।

এটা বোঝা বা জানা দরকার- সব ফসলের জলের চাহিদা যেমন এক নয় তেমনি একই ফসলের বিভিন্ন জাতের মধ্যেও জলের চাহিদা বিভিন্ন। কাজেই চাষের পরিকল্পনা করা দরকার- চাষের কাজে ব্যবহারের জন্য কতটা জল আছে- সেচ দেবার মত এবং মাটির সঞ্চিত রস কতটা আছে অর্থাৎ জলের যোগানের উপর নির্ভর করে কি ফসল এবং কোন জাতের ফসল কোন মরশুমে চাষ করব, সিদ্ধান্তটা সেভাবেই নিতে হবে। তবেই চাষ লাভজনক হবে।

এবার পৃথিবীর জলছবিটা বোঝার চেষ্টা করি- পৃথিবীর উপরের ৭১ ভাগ জলে ঢাকা। বেশীটাই সমুদ্র। এই জলকে এক কিলোমিটার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সম্পন্ন চৌবাচ্চায় রাখতে হলে ১৪০ কোটি চৌবাচ্চা লাগবে। এই যে এত জল এর ৯৭ ভাগই সমুদ্রের লোনা জল- এখনও সেচের কাজে ব্যবহারের অযোগ্য। বাকি ৩ ভাগ জলের ২ ভাগই (২.৩১%) মরু অঞ্চলে বরফ হয়ে জমে আছে। আর ১ ভাগের বেশ কিছুটা কম (০.৬৯%) নদী, নালা, পুকুর, জলাশয়, মাটির নীচে আছে যেটা ব্যবহার যোগ্য মিঠা জল-চাষবাস, খাবার, গৃহস্থলী ইত্যাদির জল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

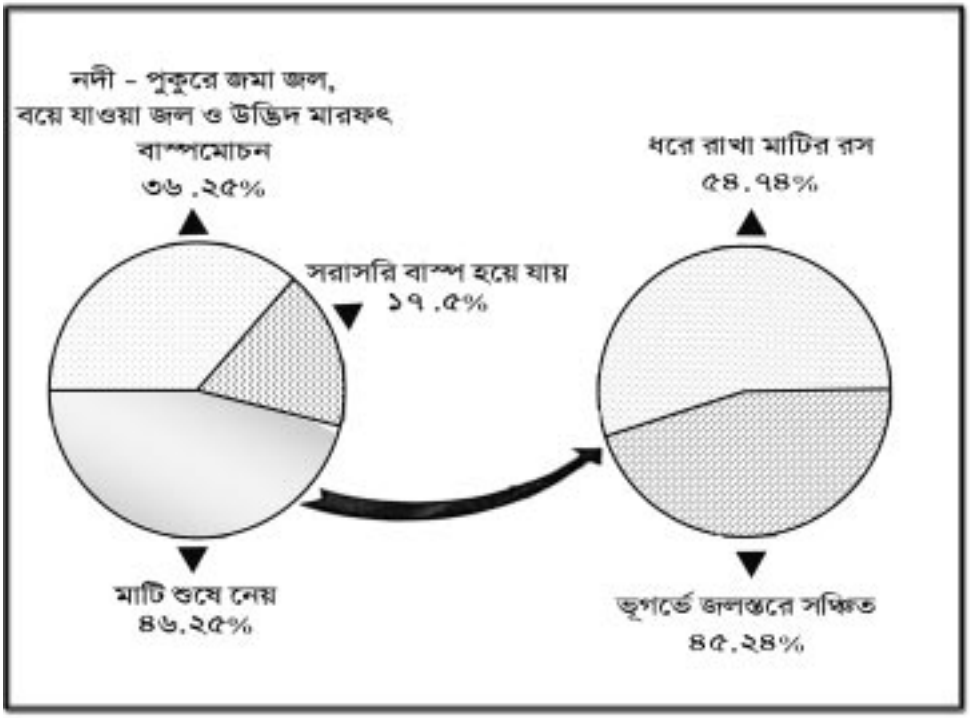

আমাদের জল ছবিটাই কেমন? পশ্চিমবাংলায় বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০০০ মি:মি: (হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলে ২৭৩৯ মি:মি: ও গাঙ্গেয় সমতল অঞ্চলে ১৪৩৯ মি:মি:)। যদি বছরের সম্পূর্ণ বৃষ্টির জল দাঁড়িয়ে থাকত বা ধরে রাখা যেত - আমাদের রাজ্য এক বছরেই ২ মিটার জলের তলায় চলে যেত। মোট বার্ষিক বৃষ্টির জলের ১৮ শতাংশ বাষ্প হয়ে উঠে যায়, ৩৬ শতাংশ নদী, নালা, খালবিল, পুকুর, নদীতে জমা হয়। ৪৬ শতাংশ জল মাটি শুষে নেয়। এই মোট ৪৬ শতাংশের আবার ৫৫ শতাংশ মাটির রস হিসাবে থেকে যায় (মাটি নিজে ধরে রাখে) ও বাকি ৪৫ শতাংশ ভূগর্ভের জল স্তরকে সমৃদ্ধ করে। মোটামুটি এটা ছিল ১৯৭৪ সালের জাতীয় গড় হিসাব। বর্তমানে এর চেহারা অনেকটাই হয়ত পাল্টে গেছে।

এবার জলের চাহিদা ও ব্যবহারের চিত্রটা দেখা যাক- গত তিন চার দশকে তথাকথিত অত্যাধুনিক চাষ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ও বহুল বিজ্ঞাপিত সবুজ বিপ্লবের নামে দেশে যে চাষ ব্যবস্থা আনা হয়েছে সেটা দাঁড়িয়ে আছে মূলত: তিনটি উপাদানের উপর। সেগুলি হল:

ক) উচ্চ ফলনশীল শংকর জাতের বীজের ব্যবহার
খ) অধিক মাত্রায় রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার
গ) সেচের পরিমাণ বাড়ানো (উচ্চ ফলনশীল শংকর জাতগুলির চাহিদা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী)
ঘ) যন্ত্রের ব্যবহার। এছাড়া, ফসল নির্বাচনেও পরিবর্ত্তন এসেছে, প্রাধান্য পাচ্ছে অর্থকরী ফসলের (ক্যাশ ক্রপ) চাষ।

কাজেই ক্রমবর্ধমান সেচের চাহিদা মেটাতে যেসব সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, সেগুলি হল প্রধানত: ১) ভূগর্ভের জল অত্যধিক উত্তোলনের ফলে জলস্তর নেমে যাচ্ছে, ও পানীয় জলের অভাব দেখা দিচ্ছে,উপকূল অঞ্চলের ভূগর্ভে লোনা জল ঢুকছে। ২) ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারে, একই জমিতে একাধিক বার একই ফসল- বিশেষত: ধান চাষের ফলে ভূগর্ভে জল চুইয়ে যাবার পথ সংকুচিত বা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ৩) বৃষ্টির জল বাধাহীনভাবে বয়ে যাবার ফলে (আল ছোট হয়ে গেছে ইত্যাদি) জমিতে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ক্ষমতা কমছে। ৪) অত্যধিক সেচের ফলে মাটি লোনা হয়ে যাচ্ছে, লোহা ইত্যাদি জমছে। ৫) জল ব্যবহারের অসাম্য থাকার ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা যাচ্ছে। ৬) ভূগর্ভের জল অত্যধিক উত্তোলন ও সেচের ফলে জলে আর্সেনিক, নাইট্রেট ফ্লুরাইড ইত্যাদির দূষণদেখা যাচ্ছে ও পানীয় জলের সংকট উপস্থিত হয়েছে।

তাহলে প্রশ্ন আসছে কোন জল চাষের কাজে ব্যবহার করা যাবে এবং কিভাবে?

১) জল বাস্প হয়ে উঠে যাবার আগে তার অনেকটাই যাতে ব্যবহার করতে পারি - সেদিকে নজর দিতে হবে। আচ্ছাদন বা ফসল দিয়ে মাটি ঢেকে রাখলে এই অপচয় অনেকটা বন্ধ করা যায়।

২) আবার নদী, নালা দিয়ে যে জল বয়ে চলে যাচ্ছে সে জলের অনেকটা আগেই ধরে রেখে ধীরে ধীরে সেচের কাজে সুষ্ঠ ব্যবহারে মনোযোগ দিতে হবে।

৩) পুরানো মজে যাওয়া জলাধারগুলির সংস্কার করে জল ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে ও নতুন নতুন জলাধার নির্মাণ করতে হবে। ছোট ছোট নদী, নালাগুলিতে বয়ে যাওয়া জল কিছুটা আটকে রাখার মত নির্মাণ ব্যবস্থা করে নিলেও অনেকটা জল ধরে রাখা যায়।

৪) চাষের জমিতে মাঠ কূয়ো করে জীবনদায়ী জল সেচের ব্যবস্থা বেশ ভালভাবেই হয়।

৫) আবার জমির আল উঁচু করে বেঁধে, ঢালু জমিতে সমোন্নত আল বেঁধে, বন বাগিচায় শোষক ফাঁদ কেটে মাটিতে জল বসানো বা শোষণের ব্যবস্থা করে জল ধরে রাখা যায়। চাষের অযোগ্য পতিত জমিতে বন, ঘাসের আচ্ছাদন তৈরী করে বয়ে যাওয়া জলের গতি কমালে মাটিতে জল বেশী পরিমাণ শোষিত, সঞ্চিত হয় ও সাথে ভূমি ক্ষয় কমে যায়।

৬) চাষের জমিতে জল ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে জৈব পদার্থের পরিমাণ গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর ঐ জৈব পদার্থের গুণমানের উপর জল ধারণ ক্ষমতা নির্ভর করে। দেখা গেছে জৈব সার তার নিজস্ব ওজনের ৫-১৪ গুণ পর্যন্ত ওজনের জল ধরে রাখতে পারে। কাজেই ভালো মানের, কম্পোস্ট, সবুজ সার, ইত্যাদি নিয়মতি মেশালে মাটিতে সঞ্চিত রসের পরিমাণ বাড়তে থাকে, ভূমিক্ষয় কম হয়, মাটিতে বসবাসকারী রোগ জীবাণুর সংখ্যা কমে ও সর্বোপরি মাটি জীবন্ত হয়- উর্ব্বর ও সরস হয়।

৭) এতো গেল সংক্ষেপে জল ধরে রাখার কথা। সেচের জল ব্যবহারেও সতর্ক হতে হবে। কম সেচ লাগে এমন জাত ও ফসল নির্বাচন ও চাষ করতে হবে। সেচ যদি দিতে হয় তবে জানতে হবে কোন ফসলের কতটা জল দরকার, সেটা কখন কখন দিলে বেশী উপকার পাওয়া যাবে এবং সেচের জলের গুণমান ঠিক আছে কিনা।

সতর্কতা: জল ধরে রাখা ও সেচের মতই জল নিকাশী ব্যবস্থাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অতিরিক্ত সেচ বা জল জমিয়ে রাখা (চাষের জমিতে) উৎপাদনের পক্ষে ক্ষতিকর এটা মনে রাখা দরকার। নিকাশী ব্যবস্থা ভাল থাকলেই মাটির উৎপাদিকা শক্তি বজায় থাকে, মাটি জীবন্ত থাকে। (জল ব্যবহারের সমস্যা ও প্রযুক্তি বিষদ জানতে বর্তমান চাষের সমস্যা ও স্থায়ী চাষের কৌশল বিষয়ক সহজপাঠ প্রথম ভাগ দেখুন)।

সেচের জলের গুণাগুণ: যে কোন উৎস থেকে সেচ দেওয়া হোক না কেন জলে কিছুটা লবন দ্রবীভূত থাকবেই। দ্রবীভূত লবনের পরিমাণ ও প্রকৃতি জলের উৎস ও বয়ে যাওয়া মাটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। জলের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, সালফেট, কার্বোনেট, বাই কার্বোনেট জাতীয় লবন মিশে থাকে। এগুলির মধ্যে সেলেনিয়াম, মলিবডেনাম, ফ্লুরিন ও আর্সেনিক যদি অতি মাত্রায় থাকে উদ্ভিদ সেগুলিও জলের সাথে গ্রহণ করে এবং ফসল জাত খাদ্যের মাধ্যমে প্রাণী দেহে বিষক্রিয়া ঘটে।

সেচের জলের গুণাগুণ নির্ণয়ে যে যে বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়, তা- হল

১) দ্রবীভূত লবনের পরিমাণ
২) ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আয়নের অনুপাত
৩) বাই কার্বনেট আয়নের অনুপাত
৪) বোরন আয়নের পরিমাণ
৫) পটাসিয়াম ও নাইট্রেট আয়নের পরিমাণ

দ্রবীভূত সব লবনের পরিমাণ বেশী থাকলে উদ্ভিদের শিকড়ের আশে পাশের অঞ্চলে বেশী লবন ঘনীভূত হয় ফলে মাটির রসের ঘনত্ব উদ্ভিদ কোষের ঘনত্বের থেকে বেশী হয়। ফলে মাটিতে প্রচুর জল থাকলেও অভিশ্রবণ প্রক্রিয়ায় শিকড় জল শোষণ করতে পারে না। সেচের জল পরীক্ষায় সাধারণত: জলে মিশ্রিত লবনের পরিমাণ জানানো হয়। লবনাক্ততার মান জলের বিদ্যুৎ বহণ ক্ষমতা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর একক 'মিলি মোজ' প্রতি সেমি।

পরীক্ষিত জলের মান:

- ১ মিলি মোজ/সেমি-র কম হলে জলে স্বাভাবিক পরিমাণ লবন আছে যা সেচের জন্য উপযুক্ত।
- ১-২ মিলি মোজ/ সেমি-র মধ্যে হলে সেচ দেওয়া যাবে তবে অঙ্কুরোদ্গমের সময় সেচ দেওয়া যাবে না।
- ২-৩ মিলি মোজ/ সেমি-র মধ্যে হলে কেবল লবন সহনশীল ফসলে (ধান,বিট ইত্যাদি) সেচ দেওয়া যাবে, কম সহনশীল ফসলে নয়।
- ৩ মিলি মোজ/ সেমির বেশী হলে সেচের অযোগ্য।

তথ্য - ১) সহজ কথায় বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষবাস, গোষ্ঠ ন্যায় বান, আনন্দ এজেন্সি, কোলকাতা।

২) বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার পুস্তিকা, জল দূষণ ও তার প্রতিকার, বিজ্ঞান দরবার ও অন্যান্য ১৫ টি সংস্থা/সংগঠন ১৯৯৯।

4) State of Indian Environment, Centre for Science and Environment, Second Citizen's Report 1984-85 and 5th Report 1997.

আচ্ছাদন বা মাল্চ

আচ্ছাদন কি

প্রকৃতির রোষ (কড়া রোদ, কাটা বৃষ্টি, তেজী হাওয়া বা ঝড়) থেকে ঢাকনা দিয়ে মাটিকে রক্ষা করাকে আচ্ছাদন বা মাল্চ বলে। কড়া রোদে মাটি শুকিয়ে যায়, বিশেষত নাইট্রোজেন সার (গাছের একটি প্রধান খাদ্য) বাষ্প হয়ে উবে

যায়, মাটির জৈব পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়, ফলে মাটির জীবনদায়ী জীবাণু, অণুজীব, বীজাণু ইত্যাদির সংখ্যা কমে গিয়ে মাটির উৎপাদিকা শক্তি কমে যায়। আবার প্রচন্ড বেগে বৃষ্টির ফোটা খোলা মাটিতে পড়ে মাটির কণা আলগা করে দেয় ও জলের সাথে উর্বর মাটি ও খাদ্যকণাও বয়ে চলে যায় ফলে হয় ভূমিক্ষয়। ঢাকনা ও বাধা না থাকায় মাটিতে জল কম বসে (ক্রমে জল ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়) ও শুকনোর সময় রসের অভাব হয়। আবার ঝড়ের সময় উপরের উর্বর মাটি বাতাসে উড়ে গিয়ে ভূমিক্ষয় ঘটায়, ফলে মাটি নিরস হয়ে পড়ে (এটাও ভূমিক্ষয়)। এছাড়া মাটির উপরে নুন জমা হয় ও মাটি শক্ত হয়ে যায়। আচ্ছাদন থাকলে আগাছা কম হয়।

কেন আচ্ছাদন

উপরে বলা কারণগুলো থেকে মাটিকে বাঁচাতে আচ্ছাদন ব্যবহার করা দরকার। এতে মাটির উর্বরতা শক্তি, উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। মাটির জীবনী শক্তি অনেকটাই ধরে রাখা যায় বা বাড়ানো যায়। আচ্ছাদক ফসলের চাষ করে কিছু উৎপাদনও পাওয়া যায়। জৈব আচ্ছাদন মাটিতে জৈবসারের যোগান দেয়।

কিভাবে ও কত রকমের আচ্ছাদন

জৈব, অজৈব ও আচ্ছাদক ফসল দিয়ে আচ্ছাদন করা হয়।

জৈব আচ্ছাদন

শুকনো পাতা, খড় কুটো ইত্যাদি ফসলের অবশিষ্ট অংশ, পচা-ছেঁড়া ও ফেলে দেওয়া চট, কাপড়, নারকেল, সুপারী ইত্যাদির ছোবড়া, ধানের তুষ, বাদামের খোলা, আঁখের ছিবড়া ইত্যাদি।

অজৈব আচ্ছাদন

পাথরের নুড়ি, অব্যবহার্য্য (ফেলে দেবার যোগ্য) পলিথিনের চাদর, মাটির হাড়ি কলসীর ভাঙা টুকরো ইত্যাদি।

আচ্ছাদক ফসল

জমি পতিত না রেখে সব সময় কিছু ফসল চাষ করে মাটি ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করা দরকার।

আমন ধান কাটার পর চাষ করে কোনও ফসল লাগালে জমি ঢাকা থাকে। এছাড়া জমি না চষে পয়রা বা রিলে চাষের মাধ্যমেও মাটিকে আচ্ছাদন দেওয়া যেতে পারে ও সাথে বাড়তি ফলনও পাওয়া যায় যেমন - খেসারী, শীতের মাসকলাই, তিসি, বাকলা, ছোলা, মুসুর, গুয়ার ইত্যাদি। গ্রীষ্মে (প্রাক খরিফ) তিল, বরবটি, মুগ, চীনাবাদাম ইত্যাদি। নিচে আচ্ছাদন করার মত কয়েকটি ফসলের নাম দেওয়া হল -

ডালশস্য	তেলবীজ	গোখাদ্য	সবুজ সার	আগাছা
খেসারী, মুগ	চীনা বাদাম	বরবটি	ধঞ্চে, শন ইত্যাদি	বেথো, কুট্‌জু
মুসুর, ছোলা	কুসুম, তিসি,	গাইমুগ	গুয়ার	পিউরেরিয়া
বরবটি, মঠবিন	সরষে ইত্যাদি	বারসীম ইত্যাদি		
গাইমুগ ইত্যাদি				

অন্যান্য ফসল চাষ করা হলে (যেমন বেগুন, টমেটো, লঙ্কা ইত্যাদির মধ্যে) খড়, পাতা ইত্যাদি দিয়ে অর্ন্তবর্তি জায়গায় আচ্ছাদন দেওয়া যায়। ফল বাগানে জৈব অজৈব আচ্ছাদন ছাড়াও বিভিন্ন ফসল যেমন বরবটি, মিষ্টি আলু, পিউবেরিয়া, কলাই ইত্যাদি লাগিয়ে আচ্ছাদন করা হয়। অড়হর, ভুট্টা, বাজরা ইত্যাদির সাথে মুগ, বিউলির আন্ত ফসল আচ্ছাদনেও কাজ করে।

সতর্কতা

জৈব আচ্ছাদনের ফলে উইপোকার আক্রমণ হতে পারে। আচ্ছাদক ফসল যেন প্রধান ফসলের প্রতিযোগী না হয়। অজৈব আচ্ছাদন (পাথরের নুড়ি, মাটির, হাড়ি কলসীর টুকরো, পলিথিনের চাদর ইত্যাদি) যেন চাষের অসুবিধার ও দূষণের সৃষ্টি না করে।

তথ্য সার্ভিস সেন্টার কলকাতা

কলসি সেচ

ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের শুকনো এবং প্রায় শুকনো অঞ্চলে চাষের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জল পাওয়া যায় না। মাটির জল ধারণ ক্ষমতা কম। মাটির ওপর আচ্ছাদন না থাকার ফলে এইসব অঞ্চলে একবিন্দু জলকেও সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। তাই এইসব এলাকায় ফসল চাষে এবং নার্সারি তৈরীর জন্য কলসি সেচ খুবই কার্যকরী। মাঠের মধ্যে পাইপ লাইন করে বিন্দুসেচ ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং গরীব মানুষের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু কম খরচে খরা এলাকায় সেচের জন্য কলসি সেচ খুবই উপযুক্ত ও জল সাশ্রয়কারী। সবজী বাগানের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত।

কি কি লাগবে

ঢাকনা সমেত একটা মাটির কলসি। কলসির ব্যাস হবে ১৬-১৮ ইঞ্চি যাতে ৮-১০ লিটার জল ধরে। কলসির তলার দিকে ৩-৪ ইঞ্চি উপরে ৫-৭টি ফুটো থাকবে। যে নিয়মগুলি মেনে কলসিটি বানালে ভালো হয়। তা হল -

(চিত্র -১)

৪ ভাগ মাটি ও ১ ভাগ বালি মিশিয়ে, জলের কুঁজো যে ভাবে তৈরী হয় কলসি টি তৈরী করাতে পারলে ভালো হয়। কলসির গা চকচকে করার জন্য আলাদা করে কোনও রং মাটির প্রলেপ না দিলে ভাল হয়। এর উদ্দেশ্য কলসির গায়ের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ছিদ্রগুলি বন্ধ না করা। এর ফলে কলসির ভেতরে সঞ্চিত জল জলকণার আকারে বাইরে আসতে পারবে এবং কলসির গা সবসময় ঘেমে থাকবে। বাজার থেকে কলসি কিনেও এই ধরণের সেচ ব্যবস্থা চালু করা যায়। (চিত্র -১)

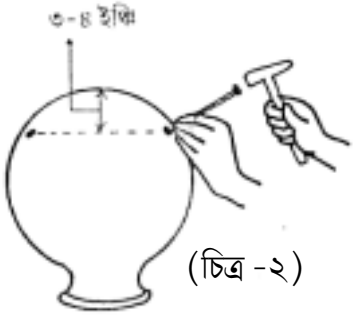

(চিত্র -২)

- ৮-১০ লিটার জল ধরে এমন কলসি কিনতে হবে।
- কলসির তলার থেকে মোটামুটি ৩-৪ ইঞ্চি ওপরে কলসির গায়ে খুব সাবধানে তলার থেকে ৫-৭ টি ফুটো করতে হবে। পেরেক জোরে ঠুকলে কলসিটাই ভেঙে যেতে পারে। **কাঁচা অবস্থায় অথবা ছুতোরের তুরপুন দিয়ে ফুটো করলে ভাঙার ভয় থাকে না। (চিত্র -২)**

পদ্ধতি :

- মাটিতে দেড় হাত গভীর দেড় হাত চওড়া একটা গর্ত করতে হবে যাতে কলসি বসালে চারপাশে ২ ইঞ্চি মতো জায়গা থাকে। (চিত্র -৩)

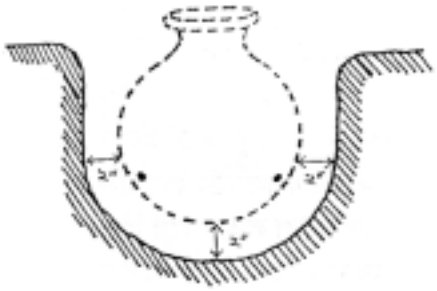

(চিত্র -৩)

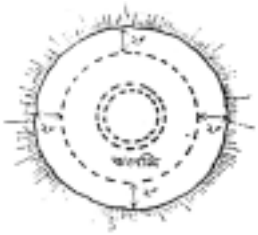

- কলসি গর্তে বসানোর আগে গর্তের তলায় কিছুটা কম্পোস্ট মিশ্রিত কাঁকুরে মাটি দিতে হবে যাতে গর্তে বসানোর পর কলসির গলা ওপরে থাকে। কম্পোস্ট মিশ্রিত কাঁকুরে মাটি দেওয়ার কারণ গাছের কিছুটা খাদ্য কলসির ফুটো দিয়ে বেরোনো জলের সঙ্গে মিশে শেকড়ের কাছে যাবে, ফলে চারাগুলো জল ও খাদ্য দুটোই পাবে এবং তাড়াতাড়ি বাড়বে।

(চিত্র - ৪)

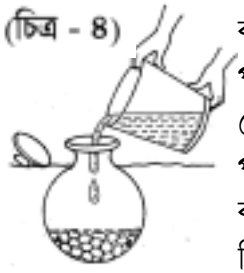

- জল কতটা ব্যবহার হয়েছে বোঝার জন্য কলসির মধ্যে ফুটোর একটু ওপর পর্য্যন্ত কয়েকটি ছোট নুড়ি পাথর রেখে দেওয়া যেতে পারে। জল নুড়ি পাথরের একটু ওপর পর্য্যন্ত নেমে গেলেই আবার জল ভর্তি করে দিতে হবে। কলসি কখনোই শুকিয়ে যেতে দেওয়া চলবে না। নুড়ি পাথরগুলো ছাঁকনিরও কাজ করবে। জলে মিশ্রিত পলি পাথরগুলোতেই আটকে যাবে, ফলে কলসির গায়ের ফুটোগুলো বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কমবে। এক্ষেত্রে মাঝে মাঝে পাথরগুলোকে কলসির থেকে বার করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। (চিত্র৪)

(চিত্র -৫)

- ফুটো কলসির ক্ষেত্রে একটা মিহি কাপড় বা চট গর্তের মধ্যে রেখে তার ওপরে কলসিটা রাখলে ভালো হয়। এর ফলে কলসির গায়ের ফুটো দিয়ে জল বেরিয়ে মিহি কাপড়ের বা চটের মধ্যে দিয়ে বাইরের মাটির সংস্পর্শে আসবে, বাইরের মাটি কলসির গায়ের ফুটোগুলো বন্ধ করতে পারবে না। চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরোবে বলে জলও কম খরচ হবে। এরপর শুকনো পাতা এবং কম্পোস্ট মিশ্রিত মাটি (কাঁকুরে মাটি হলে ভাল হয়) দিয়ে কলসির চারপাশে গর্তের মধ্যে ফাঁকা জায়গাটা ভরে দিতে হবে। (চিত্র-৫)

(চিত্র-৬)

- এবার কলসিতে জল ঢালতে হবে এবং কলসির মুখ ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়ে রাখতে হবে যাতে জল বাস্প হয়ে উবে যেতে না পারে এবং মশাও জলে ডিম পাড়তে না পারে। (চিত্র -৬)

- ১-২ দিনের মধ্যে কলসির চারদিকের মাটি একটু ভিজিয়ে নিয়ে বীজগুলো বসাতে হবে। চারা না গজানো পর্য্যন্ত প্রয়োজন মত হালকা সেচ দিতে হবে। (চিত্র -৭)

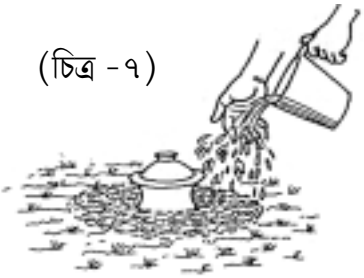

(চিত্র -৭)

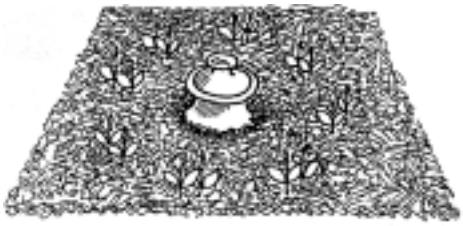

(চিত্র -৮)

- কলসির চারপাশ এবং চারাগুলোর গোড়ায় শুকনো খড়-পাতা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে, যাতে বাস্পীভবন কম হয়, রস ধরে রাখবে। (চিত্র -৮)

- কলসির জলের ৫ ভাগের ৩ ভাগ জল যখন ব্যবহার হয়ে যাবে তখন আবার জল ভরে দিতে হবে। (চিত্র -৯)

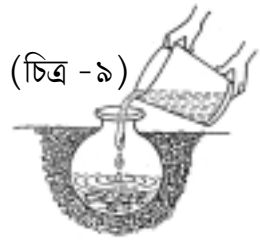

(চিত্র -৯)

কলসি সেচের সুবিধা

- এই সেচ পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ শক্তি বা অন্য কোনও প্রকার শক্তি ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। একবার জল কলসিতে ভর্তি করে দিলে এটা দিনের ২৪ ঘন্টাই সেচের কাজ করে।

- কলসির চারপাশের ছড়ানো কম্পোস্ট ফুটো দিয়ে বেরোনো জলের সঙ্গে মিশে চারা গাছগুলোকে জল ও খাদ্য দুই-ই জোগায় ও গাছের তাড়াতাড়ি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এর ফলে অন্য সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কমে যায়।

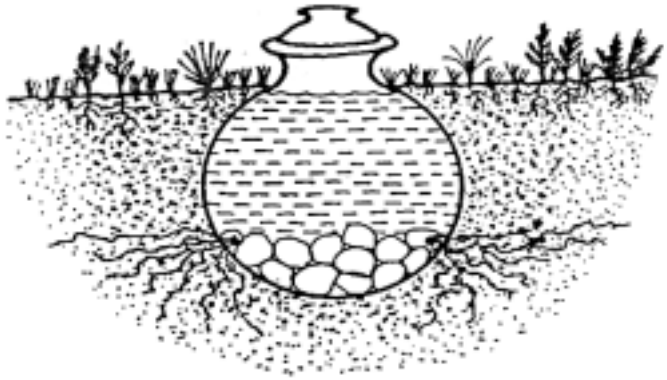

(চিত্র -১০)

- জলের সাশ্রয় হয় কারণ মাটির তলায় জল নি:সৃত হয় ও বাস্পীভবনের হার কমে।

- ওপর থেকে সেচ দিলে বাস্পীভবনের ফলে জল উবে যায় এবং ক্যাপিলারি প্রক্রিয়ায় মাটির নীচের লবণ ওপরে উঠে এসে জমে যায়। কলসি সেচের ক্ষেত্রে যেহেতু বাস্পীভবন খুবই কম হয়, সেহেতু মাটির ওপরে লবণ জমে যাওয়ার সম্ভাবনাও কম।

- রক্ষণাবেক্ষণের খরচও কম।

- যেসব আগাছা মাটির উপরিতলের জল ও খাদ্যের জন্য প্রতিযোগিতা করে, তাদের সহজে বাড়তে দেয় না। মাটির অন্তত ৬-৮ ইঞ্চি গভীরে না গেলে যেহেতু কলসির থেকে বেরোনো জলের নাগাল তারা সহজে পায় না, সেহেতু তারা বেশী বাড়ে না।

- তরল জৈব সার ও খুব কম পরিমাণে রাসায়নিক সারের নির্য্যাস কলসির জলে মিশিয়ে দিলে গাছের নেবার সুবিধা হয়, খরচ কমে।

- কুমোরদের কলসি তৈরীর কাজ দিয়ে গ্রামে কুটির শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়।
- পরিবারের সকল সদস্য /সদস্যাই সহজে ব্যবহার করতে পারে।
- ভূগর্ভের গভীর স্তরের জল তুললে লবণাক্ততা বা আর্সেনিকের সমস্যা দেখা দিতে পারে। কলসি সেচে এই ধরনের পরিবেশগত সমস্যা হয় না।
- মাটি ও পরিবেশের দূষণ হয় না বরং পরিবেশ মুখী হয়। (চিত্র -১০)

ব্যবহার

- বীজ এবং চারা গাছের দূরত্ব কলসির দেওয়াল থেকে ৬ ইঞ্চির মধ্যে হওয়া উচিত।(চিত্র -১১)
- শুষ্ক বা প্রায় শুষ্ক অঞ্চলে সমতলের বাগানগুলিতে একটি ১০ হাত লম্বা ১০ হাত চওড়া বেড সমান ৪ ভাগে ভাগ করে এক-একটি ভাগের মাঝখানে ১টি করে কলসি বসিয়ে তাকে ঘিরে সবজি চাষ করা যেতে পারে। (চিত্র -১২)

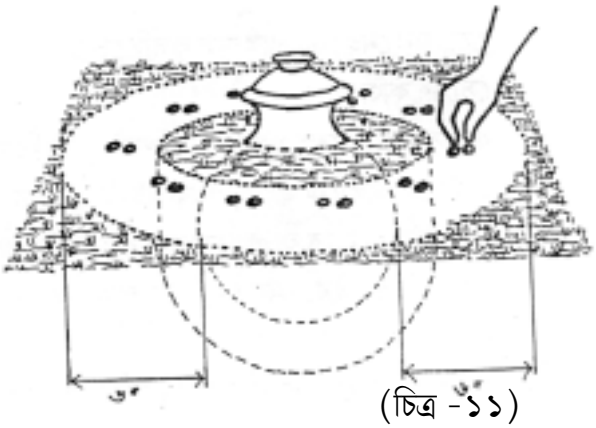

(চিত্র -১১)

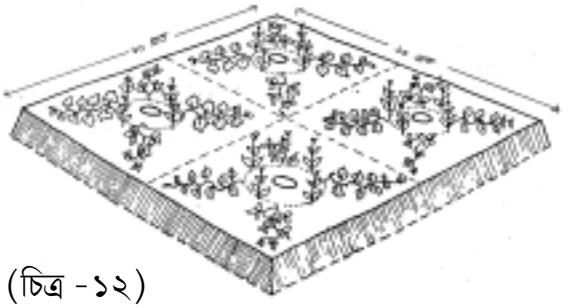

(চিত্র -১২)

- চাষের জমিতে ১০ ফুট লম্বা এবং সাড়ে চার থেকে পাঁচ ফুট চওড়া বেড সমান ৩ ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগে ১ টি করে কলসি বসিয়ে সবজি চাষ করা যেতে পারে।
- ছোট বাগানে লাউ, কুমড়ো, শসা জাতীয় বা লতিয়ে যাওয়া সবজি চাষের জন্য ২০ ফুট লম্বা ২০ ফুট চওড়া জায়গার মাঝখানে একটি সার্কল্ গার্ডেন করে তার মাঝে একটি বড় কলসি বসিয়ে দিলে তা ওই পরিমাণ জায়গা সেচের পক্ষে যথেষ্ট। এই ধরণের লতার শুধু শিকড়গুলি কলসির কাছে থাকলেই পুরো জায়গাটায় লতাগুলি ছড়িয়ে পড়ে। (চিত্র -১৩)

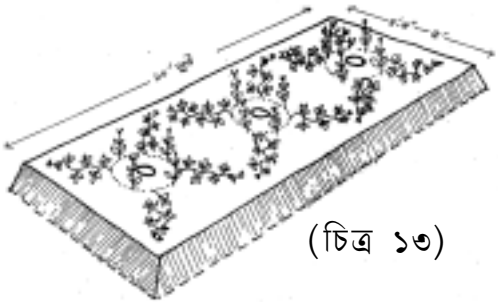

(চিত্র ১৩)

লক্ষ্য নজর :

- মাঝে মাঝে কলসির ভেতরের নুড়ি তুলে ধুয়ে দিতে হবে।
- জল শেষ হবার আগেই কলসিতে জল দিতে হবে।
- খড় কুটার আচ্ছাদন রাখতে হবে।
- কোদাল ইত্যাদি দিয়ে চাষের সময় সাবধানে কাজ করতে হবে।

সফল নজির

- কর্ণাটকের প্রায় শুষ্ক অঞ্চল এবং অসমতল বা উঁচু নীচু জমিতে কলসি সেচ একটি জনপ্রিয় ও প্রচলিত পদ্ধতি।
- পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বীরভূম, পরুলিয়া জেলা সাধারণত শুষ্ক এলাকা হিসেবে পরিচিত। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। ফলে ফসল চাষের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জলের সরবরাহ থাকে না। এইসব শুষ্ক অঞ্চলে কলসি সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করে চাষের জলের অভাব কিছুটা মেটানো যায়। এখানকার কয়েকটি গ্রামে চাষীরা কলসি সেচকে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করে জলের অভাব কিছুটা মেটাতে সফল হয়েছেন।
- পুরুলিয়া জেলার ঝাড়গ্রামে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে পরীক্ষা করে দেখে বেশ কয়েক বছর আগেই সুপারিশ করা হয়েছে।

তথ্য সূত্র

Resource Management in Rainfed Drylands, Myrada an IIRR, 1997
Environmentally Sound Technology for Women in Agriculture, ISWA and IIRR, 1996

সার্ভিস সেন্টার কলকাতা

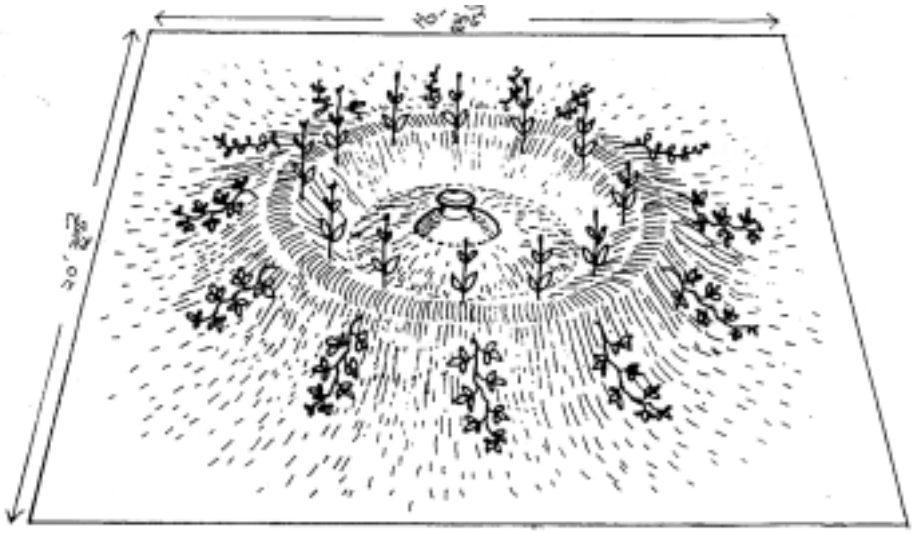

পয়রা করে চাষ বা রিলে ক্রপিং

পয়রা চাষ কি

একখন্ড জমিতে একটি ফসল ওঠার আগে (অর্থাৎ জমিতে একটি ফসল থাকতে থাকতেই) পরবর্তী ফসলের বীজ বুনে দিয়ে ফসল চাষ করাকে পয়রা চাষ বা রিলে ক্রপিং বলে । এক্ষেত্রে দুটি ফসলের মধ্যে জমি খালি পড়ে থাকেনা। উদাহরন আমন ধান কাটার ৭-১০দিন খানেক আগে খেসারী, ছোলা, মটর, তিসি, বাকলা ইত্যাদির বীজ বুনে দেওয়া ও এই সব ফসলের অঙ্কুরোদ্গম হবার সাথে সাথে আমন ধান তোলা।

পয়রা চাষ কেন

মাটির সঞ্চিত রস, পূর্ববর্তী ফসলের অব্যবহৃত খাদ্য ও জল এবং পূর্ববর্তী ফসলের জীবন কালের কিছুটা সময় কাজে লাগিয়ে পরবর্তী আরেকটি ফসল তোলা সম্ভব। এতে চাষির বাড়তি ফসল ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়, জমি ঢাকা থাকে ফলে উর্বরতা ধরে রাখা যায়, আর সময়েরও সাশ্রয় হয় । বিশেষ করে যেখানে সেচের ব্যবস্থা নেই সেখানে আমন ধান চাষের পর পয়রা করে চাষ খুবই উপযোগী। পয়রা করে চাষে পুঁজি কম লাগে (শুধু বীজের খরচ)।

সুষ্ঠু পয়রা চাষ কি

জমিকে চাষের মাধ্যমে এমন ভাবে ব্যবহার করা হবে যে, দুটি ফসলের মধ্যে জমি খালি পড়ে থাকবে না। ফসল নির্বাচন ও বোনার সময় নির্বাচন এমন হবে যে সময় পরবর্তী ফসলের বীজ বোনা হবে তখন দাঁড়ানো ফসলের সাথে

প্রতিযোগিতা শুরু হবেনা, পরপর ফসলগুলি জমির উর্বরতা নষ্ট করবে না, মাটির সঞ্চিত রসে পরের ফসলটি হয়ে যাবে, যার জন্য বিশেষ পরিচর্যারও দরকার হবেনা (সেচ, আগাছা দমন, জমি চাষ)।

পয়রা চাষের মূলনীতি

ক) যে ফসল পয়রা হিসাবে করা হবে সেটা অল্প দিনের ফসল হবে।

খ) যে ফসল পয়রা করা হবে সেটা খরা সহনশীল হবে, মাটিতে অতিরিক্ত রস থাকলেও অঙ্কুরোদগমে ক্ষতি করবে না।

গ) যেহেতু জমি চাষ না করেই বীজ ছড়ানো হয় তাই এই ফসলের বীজ মাটির সংস্পর্শে এলেই অঙ্কুরোদগমের ক্ষমতা ভাল থাকবে।

ঘ) পয়রা ফসলটি ভিন্ন পরিবার ভুক্ত হবে । ভিন্ন পরিবারের মিশ্র ফসল হলে ভাল (উদাহরণ : ছোলা ঔ তিসি, মুসুরী ঔ তিসি, গম ঔ সরষে (বিশেষ এলাকা ও অবস্থানে)

ঙ) দানা শস্যের পর পয়রা হিসাবে শুঁটি বা তেল বীজ জাতীয় ফসল নির্বাচন করতে হবে ।

চ) পয়রা ফসলের বীজের পরিমাণ ৩০-৪০ শতাংশ বেশি দিতে হবে।

পয়রা চাষের উদাহরণ

ক) আমন ধানের সাথে পয়রা হিসাবে খেসারী, ছোলা, মটর, মুসুরী, সরষে, তিসি, বাকলা, ধনে, গম (স্থান বিশেষে), একক বা মিশ্র চাষ।

খ) আলুর সাথে কুমড়ো, তিল।

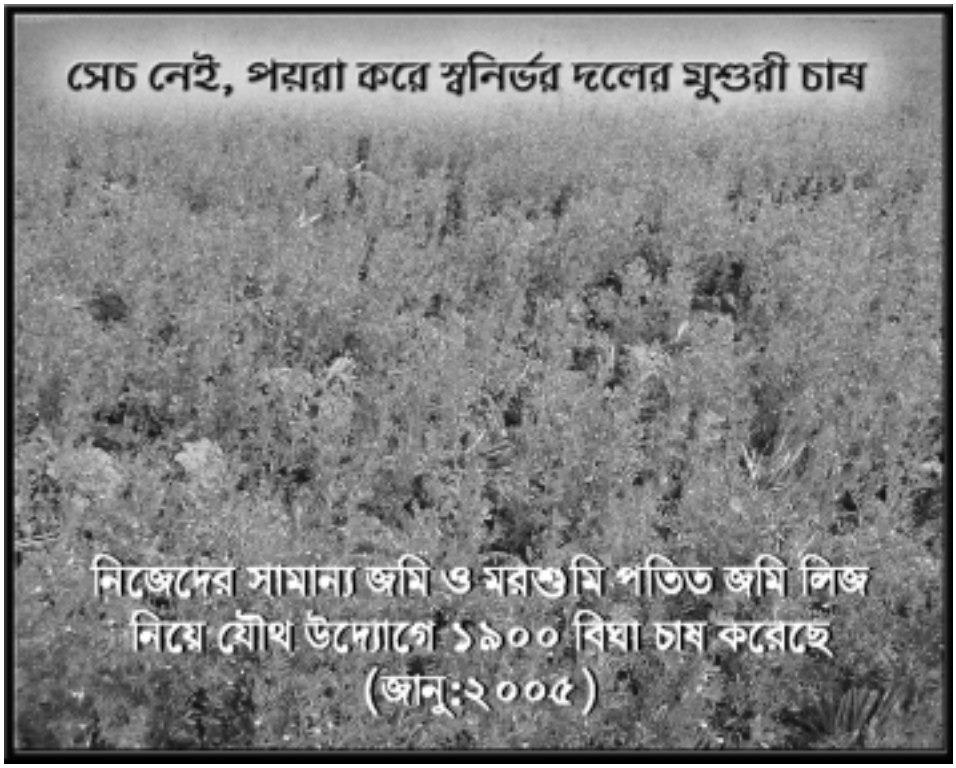

সতর্কতা

ক) বীজ বপনের সময়টি সতর্কতার সাথে ঠিক করতে হবে (দাঁড়ানো বা মূল ফসলটি কবে কাটা পড়বে সেটা বিবেচনা করে বীজ বপনের সময় নির্ধারণ করতে হবে)।

খ) পয়রা ফসলটি অবশ্যই কম দিনের ফসল হবে যাতে মাটির সঞ্চিত রসেই ফসল ওঠে।

গ) ফসল সুরক্ষার দিকে নজর দিতে হবে (উদাহরন আমন ধান কাটার পর গরু ছাগলের উপদ্রব থেকে ফসল রক্ষার কথা মাথায় রাখতে হবে। যেহেতু পয়রা চাষে পুঁজি, শ্রম ইত্যাদি কম লাগে তাই চাষিরা ফসলটিকে অবহেলার ফসল মনে করেন)।

ঘ) বীজ ছেটানোর ক্ষেত্রে ধান কাটার সাত থেকে দশ দিন আগে খেসারী, এবং অন্যান্য ফসল ৩-৪ দিন আগে ছেটাতে হয়। মুশুরী, সরষে, ছোলা, মটর, গম, ধনে, ইত্যাদি এর বেশী আগে ছড়ালে ফসল ভালো হয় না।

তথ্য সার্ভিস সেন্টার কলকাতা

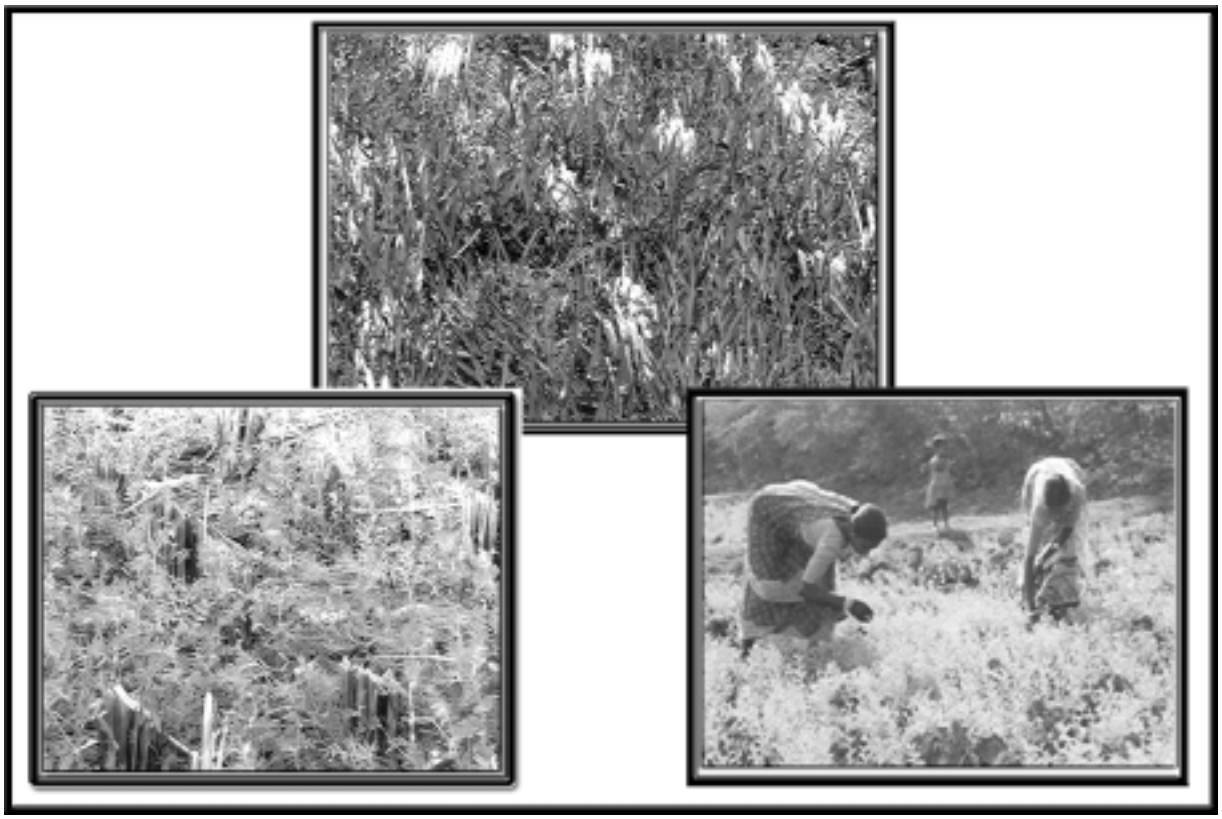

পয়রা হিসাবে খেসারী, ছোলা, ঘেষো মটর চাষ

জল সংরক্ষণ ও সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কি কি কাজ করা যাবে

১। মজে যাওয়া মাছ চাষ ও সেচ পুকুরের সংস্কার।

২। পুকুর পাড়ের ভূমি সংস্কার করে, আল বেঁধে সারা বছর শাক-সবজি চাষের উপযুক্ত করা।

৩। বৃষ্টির জল ধরার জন্য নতুন নতুন পুকুর কাটা, সেচ পুকুর তৈরী করা।

৪। বনভূমিতে ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট জল ধারণ ও শোষক চৌবাচ্চা খনন।

৫। মাঠ কূয়া- ৫% মডেল

৬। কলসি সেচের জন্য উপযুক্ত কলসি তৈরী (Skill Labour) ও ভার্মি কম্পোস্ট তৈরীর মাটির গামলা তৈরী

৭। পারিবারিক ও যৌথ জল সঞ্চয় ব্যবস্থা (Roof water hervesting Tech)

৮। সেচ নালা সংস্কার ও খনন

৯। নিকাশি নালা সংস্কার ও খনন

১০। সামুহিক পানা পুকুর, খাল, বিল, পরিস্কার করা

১১। পতিতজলা ভূমি সংস্কার - নিকাশি নালা তৈরী করে চাষ যোগ্য করার কাজ (উদা: মহানন্দপুর)

১২। মজে যাওয়া ছোট নদী - মরানদী খনন, সংস্কার করে জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো, নাব্যতা বাড়ানো পরিবহন সুযোগ বাড়ানো, মাছের পোনা ছাড়া

১৩। ঢালু জমিতে জল ও ভূমি সংরক্ষণ বাঁধ তৈরী- সমন্নত বা কন্টুর আল বাঁধা।

১৪। নিচু এলাকায় উচু ও চওড়া আল তৈরী করে নিবিড় চাষের ব্যবস্থা নেওয়া

১৫। সোর্জান পদ্ধতিতে এক ফসলী নিচু জমির উন্নয়ন ও বহুমুখী চাষের ব্যবস্থা

১৬। স্কুলের বাগান - শাক-সব্জি ও ফল

১৭। কূয়োর পাড়, কলের পাড় বাঁধানো

এ কাজগুলিতে গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের সহযোগীতা পাওয়া যেতে পারে।

৭৩ তম সংবিধান সংশোধনীর শক্তিতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কম বেশী সব জায়গাতেই ধীরে ধীরে স্থায়ী স্থান করে নিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ সংশোধন করে তৃণমূল স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া দানা বেঁধে উঠছে। গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করে এবং তাদের উদ্যোগে স্বনির্ভর দল গড়ে সার্বিক গ্রাম উন্নয়নের কাজে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা, পরিবেশ, সংস্কৃতি সহ ... জীবন ধারণ ও জীবন যাপনের সকল ক্ষেত্রেই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমেই এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা, দক্ষতা ও বিকেন্দ্রীকৃত প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর জীবিকা বিকাশের সুযোগ আছে ও এসেছে। এই কাজে সহজ, পরিবেশমুখী লোকায়ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিতে লোক কল্যাণ পরিষদ বদ্ধ পরিকর। স্বশাসনের সহায়তা কেন্দ্র হিসাবে লোক কল্যাণ পরিষদের সকল প্রকাশনাই আপামোর জনসাধারণের ক্ষমতা, শক্তি ও জীবনের মানের সমৃদ্ধি ঘটাবে এটাই লক্ষ্য। এই প্রকাশনাটি সেই পথে চলার একটি পাথেয় মাত্র।

লোক কল্যাণ পরিষদ

২৮/৮, লাইব্রেরী রোড, কলকাতা- ৭০০ ০২৬

☎ ২৪৬৫-৭১০৭, ৫৫২৯-১৮৭৮